কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা কোন্ অর্থে ?

মূল্য ৵০ আনা।

কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা কোন অর্থে?

অদ্যকার আলোচ্য বিষয়টি যে নিতান্ত গভীর, ইহা শুনিবামাত্রই হৃদয়ঙ্গম হয়। এই গভীর বিষয় ভাল করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতে পারি ঈদৃশ সামর্থ্য আমার কোথায়? ফলতঃ যদি আমি এ বিষয়ে নিজ সামর্থ্যের প্রতি নির্ভর করি, নিশ্চয় আমাকে অকৃতার্থ হইতে হইবে। বিধানের আলোকে বিষয়টি সকলের নিকটে পরিস্ফুট হইবে, ইহাই আমার মনের আশা। বক্তব্য বিষয়টি যেরূপ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের সহজে মনে হইতে পারে যে, কেশবচন্দ্রে যদি স্ববিরোধিতা ছিল, তবে সে স্ববিরোধিতার অর্থান্তর ঘটাইয়া বক্তা উহাকে লঘু করিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায়। অর্থান্তর ঘটাইয়া স্ববিরোধিতার লঘুত্বসম্পাদন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেন না সেরূপে উহা যত কেন লঘু হউক না তথাপি উহার স্ববিরোধিতা থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞান ও দর্শনের মত এই যে, আপাততঃ যে সকল বিষয় বিরোধী বলিয়া মনে হয়, সে সকল বিষয় যখন উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়া দেখা যায়, তখন তাহাদের অবিরোধিতা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এ মতের আমরা বিশেষ সমাদর করি, কিন্তু যে সকল জীবন বিরোধিতা বা অবিরোধিতার দিকে কোন দৃষ্টি না করিয়া ক্রমাগত আন্তরিক প্রেরণার অনুবর্ত্তন করিয়া জীবনপথে

---

* সপ্তষষ্টিতম মাঘোৎসবোপলক্ষে ১১ মাঘে প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

অগ্রসর হয়, সে সকল জীবনসম্বন্ধে আমেরিকার এক জন সুগভীর চিন্তাশীল ব্যক্তির উক্তি একান্ত সত্য। ইনি এদেশের অধিকাংশ যুবকের নিকটপরিচিত এবং বিশেষ ভাবে সম্মানিত; সুতরাং ইঁহার নাম উল্লেখ না করিলেও ইঁহার কথা শুনিলেই অনেকে ইঁহাকে চিনিয়া লইবেন। ইনি বলিয়াছেন, "নির্ব্বুদ্ধিতাসূচক পূর্ব্বাপর-সঙ্গতি ক্ষুদ্র মন সকলের বিভীষিকা, ক্ষুদ্রমনা রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক ও ধর্ম্মাচার্য্যগণ উহার পূজা করিয়া থাকেন। মহাত্মার পূর্ব্বাপরসঙ্গতির কিছুই প্রয়োজন নাই।" কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে এই কথাই সত্য। ভাবিয়া চিন্তা করিয়া পূর্ব্বাপরসঙ্গতি রক্ষা করিবেন, এরূপ ভাবে তিনি জীবনপথে অগ্রসর হন নাই। তিনি আন্তরিক প্রেরণায় চলিতেন। যখন তাঁহাতে যে প্রেরণা উপস্থিত হইত, তিনি আপনাকে সেই প্রেরণার অধীন করিতেন। তিনি বাহির হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই, যদি করিয়া থাকেন তাহা আন্তরিক প্রেরণার অনুবর্ত্তন করিয়াই করিয়াছেন। তাঁহাতে কখন কি উপস্থিত হইবে তিনি কিছুই জানিতেন না, সুতরাং পূর্ব্বাপর-সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলা তাঁহার সম্বন্ধে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে। এরূপ করিয়া চলাতে কেশবচন্দ্রে কি স্ববিরোধিতা ঘটিয়াছে? না, স্ববিরোধিতা ঘটে নাই, সু-অবিরোধিতা ঘটিয়াছে। কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা কোন্ অর্থে এখন সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহাতে স্ববিরোধিতা ছিল না, সু-অবিরোধিতা ছিল। স্ববিরোধিতা এ শব্দটির মত আর কোন ভাষাতে একই শব্দ দ্বারা বিরোধ প্রকাশ করিয়া আবার সেই শব্দেরই বিশ্লেষে অবিরোধ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, এরূপ শব্দ নাই। স্ববিরোধিতা শব্দটি সুতরাং কেশবচন্দ্রে যে সুন্দর অবিরোধিতা ছিল

তাহা দেখাইবার পক্ষে নিতান্ত উপযোগী। একজন দেশীয় সুপণ্ডিত ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের বিষয় বলিতে গিয়া তাঁহাতে স্ববিরোধিতা দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহা হইতে এই স্ববিরোধিতা শব্দটি গ্রহণ করা হইয়াছে। কেশবচন্দ্রে তিনি স্ববিরোধিতা দোষ ঘটিয়াছে বলিয়াছেন মাত্র, কিন্তু স্ববিরোধিতার কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। আমি বলিতেছি, কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা স্ববিরোধিতা নহে, সু-অবিরোধিতা।

ইতঃপূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের জন্ম দিনে "কেশবচন্দ্র অবোধ্য কেন ?" ইহার ব্যাখ্যায় তাঁহার জীবনের তিনটি মূলতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হয় ;— স্বাধীনতা, সমতা, একাত্মতা। এই তিনটীরই সঙ্গে স্ববিরোধিতা আছে কি না প্রথমতঃ দেখিয়া তৎপর সে সমুদায়েতে যে স্ববিরোধিতা নাই, সু-অবিরোধিতা আছে, ইহা দেখিতে হইতেছে। সর্ব্ব প্রথমে স্বাধীনতার বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাউক। স্বাধীনতা যে কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, এবং প্রতি ব্যক্তির স্বাধীনতা যে তিনি সমধিক সম্মান করিতেন, ইহা আমরা পূর্ব্ববারে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। এবার তাঁহার জীবনী হইতে ইহার বিপরীত কথা আপনাদের নিকটে পাঠ করিয়া শুনাইতেছি। ১৭৯৭ শকের ১৪ আষাঢ় তিনি ব্রহ্মমন্দিরে এইরূপ উপদেশ দেন, "যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছা প্রবিষ্ট হইয়া আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে, তখন আত্মা অধীনতার উন্নত সুখ উপভোগ করে। আত্মবশে স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুঃখ সহ্য করিতে হয়। আত্মা অধীন হইতে পারিলে ঈশ্বরের সহায়তায় ধর্ম্মের সহায়তায়, পরের অধীন হইতে

পারে। সে অধীনতা সুখের কারণ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শান্তি নিত্য লাভ হয়। ঈশ্বরের অধীন জীবের অধীন হইলে সুখের অন্ত থাকে না। সেই সাধু আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন যাঁহার আত্মা ঈশ্বরের পদতলে, ভ্রাতা ভগ্নীগণের পদতলে সংস্থাপিত হয়। সে সময়ে জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়, ভিখারীর বেশে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিতে থাকি। .... স্বাধীন বুদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিতে গিয়া সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে, সমুদায় বিষয়ে বিচার কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়; অপ্রণয়ের সহস্র সহস্র দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া জনসমাজকে ভয়ানক কষ্টে দগ্ধ করে।" "অধীনতা ব্রত স্বতন্ত্র। ইহাতে পাঁচ কোটি পাঁচ সহস্র লোক এক হইয়া যায়। পরস্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে। বুঝিতে পারিতেছি না তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পারে, তথাপি অধীন হইব। পদে পদে বিপদ্ হয় হউক, অনৈক্যের সম্ভাবনা অল্প। ইহাতে মিলনবন্ধন প্রগাঢ় হইয়া উঠে, পরসেবায় আনন্দলাভ হয়। স্বীয় বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম ইচ্ছা পরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয়। পরের অধীন হইয়া জগতের অধীন হইয়া বিনীত হইব তখন এই তাহার চেষ্টা। তখন এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্যের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ তিনের যোগ হয়। স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে। এ সময়ে বিপদ আসিলেও মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা হয়, ইহাতে তাহা হয় না। অধীনতার মধ্য দিয়া স্বর্গের আলোক প্রকাশ পায়।" কেবল যে কেশবচন্দ্র এ সময়ে অধীনতার মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন তাহা নহে, তিনি প্রচারকবর্গকে অধীনতাব্রত

অর্পণ করিলেন। তাঁহার জীবনী হইতে সেই অংশ পাঠ করা যাইতেছে। "তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি বাধ্যতা না জন্মিলে প্রচারকবর্গের মধ্যে কোন কালে শান্তি ও প্রীতি সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই; সাধনার্থও তাঁহারা প্রস্তুত হইতে পারিবেন না। এই দেখিয়া তিনি এক দিন প্রচারকবর্গকে অপরাহ্ণে আপনার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তৃতীয় তলে তাঁহার গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ ছিল। তিনি এক এক জন করিয়া প্রচারককে গৃহমধ্যে ডাকিয়া লইলেন। কেশবচন্দ্র আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। সমাগত প্রচারককে সেই আসনে উপবেশন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতে বলিয়া পরিশেষে উপস্থিত প্রচারকের হস্ত বন্ধনপূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কাহার?' উপস্থিত প্রচারক (তাঁহার প্রেরণায় উত্তর দিলেন) 'আমি আচার্য্যের ও পরস্পরের'। তিন বার প্রশ্ন ও তিন বার উত্তর কালে তিন বার উত্থান ও উপবেশন করিলে পর সেই প্রচারককে কি করিতে হইবে বা ছাড়িতে হইবে কেশবচন্দ্র তাহা বলিয়া দিলেন। এক একটি করিয়া প্রচারকগণ গৃহে প্রবেশ করিলে পূর্ব্ববৎ সমুদায় করিলেন। প্রচারকগণ যাহাতে বিনীত হন, উদ্ধতভাব পরিহার করেন, পরস্পরের অধীন হন, এজন্য (জুলাই ১৮৭৫) সাধন প্রবর্ত্তিত হইল।"

যিনি আপনার জীবনবেদে স্পষ্ট বাক্যে বলিলেন, "অধীনতা প্রিয় কেহ যদি ঠক্ হইয়া এখানে ঢুকিয়া থাকে, সে ঠক্‌কে বাহির করিয়া দিব; দিবই দিব। অধীনের দল এখানে নয়;" তিনিই আবার সকলকে অধীনতাব্রতে বাধিতে যত্ন করিলেন, ইহা কি স্ববিরোধিতা দোষ নহে? যদি ইহা স্ববিরোধিতা দোষ না হয়,

তবে আর স্ববিরোধিতা দোষ কাহাকে বলা যাইবে? এখানে স্ব-অবিরোধিতা কোথায়? স্ব-অবিরোধিতা আছে কি না বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। নিজের মত তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া তাঁহার স্ব-অবিরোধিতা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিব না। তাঁহার নিজের মতে তাঁহার স্ব-অবিরোধিতা সুস্পষ্ট সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে, ইহাই আমার আশা। সকলেই জানেন কেশবচন্দ্র ত্রিনীতি (Trinity) মতে বিশ্বাস করিতেন। ঈশ্বরের প্রকাশ সম্বন্ধে এই ত্রিনীতি তিনি সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিয়াছেন; যাঁহারা তাঁহার প্রার্থনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা এই তিন ভাবে তিন গুরুতে তিনি এক গুরু স্বীকার করিয়াছেন। তিনে এক যে গুরু তাঁহার কথা শুনিয়া চলা কেশবচন্দ্রের বিশেষ মত। ইহা স্বাধীনতাবিরোধী নহে। তাঁহার স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার ছিল না, ঈশ্বরাধীনতা ছিল, ইহা সেবার আলোচিত হইয়াছে। ঈশ্বরাধীন হইতে গেলে তিন স্থলে অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, পিতার নিকটে, পুত্রের নিকটে, পবিত্রাত্মার নিকটে। খ্রীষ্টসমাজ কথায় পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা বলিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহাদের নিকটে পিতাও থাকেন না, পবিত্রাত্মাও থাকেন না, এক পুত্রেরই সাম্রাজ্য। এ পুত্রও আবার ইতিহাসের পুত্র, তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন স্বীয় বুদ্ধির আলোকে তাহা বুঝিয়া চলা অনেক খ্রীষ্টবাদীর মত। পুত্রের অনুসরণ করিবার জন্য তবে কি খ্রীষ্টসমাজের শরণাপন্ন হইব? না, তাহা হইতে পারিব না। আমাদের শোণিতের ভিতরে হিন্দুভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই ভাবের অনুরোধে পিতা ও পবিত্রাত্মাকে(পরমাত্মাকে) ছাড়িয়া আমরা পুত্রের সমাদর করিতে পারি না। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই

তিন ভাবে ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ হিন্দু মানেন। কিন্তু এ তিনেতে সেই এক পরব্রহ্ম। এই ভাবানুরোধে কেশবচন্দ্র তিন গুরুকে এক গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অথচ তিনি তিনের ভিতরে প্রভেদও রক্ষা করিয়াছেন। "গুরু হয়ে তিন জায়গায় তুমি প্রকাশিত। পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা তিন, কিন্তু এক; গুরুকথা তিন প্রকারে তিন প্রণালীতে আসিতেছে। ইঁহারা ঈশ্বরতনয়, ইঁহাদের ভিতর দিয়া যা আসে তাও তোমার কথা। চন্দ্র, সূর্য্য, গিরি, নক্ষত্র লতা, পাতার ভিতর দিয়া যা আসে তাও তোমার কথা। আর আমার অন্তরে পবিত্রাত্মার ভিতরে বিবেককর্ণে যা শুনি, তাহা ব্রহ্ম-বাণী। তিন দিক্ দিয়ে শুনি অথচ গুরু এক। পিতা বেদ, পুত্র বেদ, পবিত্রাত্মা বেদ, ত্রিবেদ।" "তিন মত অথচ এক মত। তিন গুরু অথচ এক গুরু!" "ছিলেন এক, হইলেন অনেক গুরু, তাঁর নাম ব্রহ্ম।" "গুরু কথা কও, যার ভিতর দিয়া কথা বলিতে চাও বল। যার ভিতর দিয়া কথা বলিবে, আমি তার পাদপদ্মে প্রণাম করিব। স্বর্গরাজ্যের কথা যার ভিতর দিয়া প্রেরণ কর আমরা নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিব।" এ সকল কথা কি দেখায়? এই দেখায় যে ঈশ্বরের অধীনতা অতি বিস্তৃত। এই বিস্তৃত অধীনতাই কেশবচন্দ্রের স্বাধীনতা।

এই বিষয়টি আর এক দিক্ দিয়া দেখা যাউক। কেশবচন্দ্র তাঁহার দৈনিক প্রার্থনায় বলিয়াছেন "মহর্ষি ঈশা বলিয়া গেলেন 'যেখানে থাকিবে তোমরা পাঁচ জন, সেখানে থাকিব আমি।' আমরা যেন ঈশার মত বলিতে পারি, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে সত্য; যেখানে সত্যানুরাগ সেখানে আমি, ইনি, তিনি থাকিব।' এই কথাগুলির মধ্যে 'আমি' 'ইনি' 'তিনি' এই তিনটি সর্ব্বনাম-

পদের বিশেষ লক্ষ্য কি, ইহা সর্ব্বপ্রথমে বুঝা প্রয়োজন। আমি * —পবিত্রাত্মা, ইনি—পুত্র; তিনি—পিতা। আমি বা অহং এ দেশে প্রতিহৃদয়বাসী ঈশ্বরসম্বন্ধে নিয়ত ব্যবহৃত হইত। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন;—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।

এই অহং পরমাত্মা পবিত্রাত্মা। কেশবচন্দ্র কি তবে অদ্বৈতবাদীগণের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন? না, তাহা নহে। যিনি সর্ব্বদা আমাদের ভিতর 'আমি আছি' 'আমি আছি' বলিতেছেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এই 'আমি' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাসী, বিশ্বাসীর ঈশ্বর 'আমি আছি' ইহা তিনি আপনি প্রচার করিয়াছেন। এই সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ 'অহম' বা পরমাত্মার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

যিনি সমুদায় জীবের হৃদয়ে অবস্থিত তিনি কোন্ ঈশ্বর। ইনিই পবিত্রাত্মা, ইনিই পরমাত্মা, ইনিই 'আমি আছি'। ইঁহার সঙ্গে প্রত্যেক মানবের সাক্ষাৎসম্বন্ধ। ইনি দূরস্থ নহেন সর্ব্বদা আত্মস্থ, স্পষ্ট কথায় বলিতে হয়, আমির আমি হইয়া অবস্থিত। 'আমি' যেন পবিত্রাত্মা হইলেন, 'ইনি' কে? ইনি—পুত্র। আমি

---

* 'আমি, ইনি, তিনি থাকিব' এস্থলে 'থাকিব' এই ক্রিয়াপদ দেখাইতেছে স্বয়ং বক্তা অপরের সঙ্গে এক হইয়া থাকিবেন। সুতরাং আমি শব্দে পবিত্রাত্মা গ্রহণ অযুক্ত মনে হইতে পারে। বক্তা আপনার ভিতরকার দেবতাংশ লক্ষ্য করিয়া এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব আমি শব্দে পবিত্রাত্মা গ্রহণে কোন দোষ হইতেছে না।

বলিতে যেমন সাক্ষাৎ আমাতে পবিত্রাত্মা প্রদর্শিত হইলেন, তেমনি 'ইনি' বলিতে সম্মুখস্থ পুত্র বুঝা যাইতেছে। ঈশ্বরের পুত্রতো ঈশা, তিনি আবার সম্মুখস্থ কোথায়? যদি তিনি সম্মুখস্থ না হন, কোথায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে যাইব? য়ুডিয়া দেশে কোন্ সময়ে তিনি জন্মিয়াছিলেন, তিনি কিরূপ ছিলেন, এই সকল ভূতকালের কথা ভাবিয়া কি পুত্রকে 'ইনি' বলা যাইতে পারে? যদি আত্মস্থ পবিত্রাত্মাকে গ্রহণ করিলাম, সম্মুখস্থ পুত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা তিনি আমার জীবনের নিয়ামক হইবেন কি প্রকারে? "ইঁহারা ঈশ্বরতনয়, ইঁহাদের ভিতর দিয়া যা আসে, তা তোমার কথা;" এস্থলে পুত্রকে সম্মুখস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যিনি এত দিন পৃথিবীতে ছিলেন, এখন আর নাই, তাঁহাকে কি আর 'ইনি' বলিতে পারি? 'ইঁহারা' আর 'ইনি' এ দুইকে এক বলিয়া কেন গ্রহণ করিতেছি? 'ইঁহারা ঈশ্বরতনয়' আর 'ইনি পুত্র' এ দুই কথার মধ্যে কি কোন প্রভেদ আছে? কোন প্রভেদ নাই। প্রভেদ নাই কেন, ঈশ্বর পুত্র ঈশার নিজের কথায় তাহা প্রমাণিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, "আমার নামে যেখানে দুই জন বা তিন জন একত্র হয়, তাহাদের মধ্যে আমি বিদ্যমান।" ঈশা যাহা বলিয়াছেন তাহা কখন মিথ্যা নয়। যেখানে ধর্ম্মের জন্য সত্যের জন্য সাধকগণ একত্র হন, সেখানে তাঁহারা পুত্রের সহিত এক হইয়া যান, পুত্র সেখানে বিদ্যমান। ইঁহাদিগের ভিতরে ঈশ্বরতনয়কে দর্শন করিয়া 'ইনি' বলিয়া তাঁহাকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। 'আমি ও ইনি' যেন পবিত্রাত্মা ও পুত্র হইলেন, 'তিনি' কে? 'তিনি' ব্রহ্ম। বেদান্ত তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম

নিরূপণ করিয়া থাকেন। জগতের কর্তৃত্বে তিনি পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনুমিত; জগতের ভিতর দিয়া তিনি সাধকগণের নিকটে প্রকাশিত। ব্রহ্ম বা পিতাকে লক্ষ্য করিয়াই কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "চন্দ্র, সূর্য্য, গিরি, নক্ষত্র, লতা, পাতার ভিতর দিয়া যা আসে তাও তোমার কথা।" 'আমি, ইনি, তিনি' এ তিনের বিদ্যমানতা কোথায়? 'যেখানে সত্যানুরাগ সেখানে'। সত্য কোথায়? 'যেখানে ধর্ম্ম সেখানে সত্য'। ধর্ম্মের জন্য যে ব্যক্তি জীবন অর্পণ করে, সত্য তাহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। সত্য দর্শন করিলেই অনুরাগ উপস্থিত হয়। এই অনুরাগেই ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ সে ব্যক্তির নিকটে ব্যক্ত হয় এবং তদধীন হওয়া তাহার জীবনের সার্থকতা।

অনুরাগে ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশের অভিব্যক্তি, এই কথা বলিয়া এস্থলে অনুরাগের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। অনুরাগের উপজীব্য অধীনতা, এই জন্য কেশবচন্দ্র অধীনতাব্রতের বিষয় বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, "যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছা প্রবিষ্ট হইয়া আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে তখন আত্মা অধীনতার উন্নতসুখ উপভোগ করে।" বিবেকে স্বাধীনতা, প্রেমে অধীনতা। যে হৃদয়ে বিবেক ও প্রেম মিলিত হইয়াছে, সে হৃদয়ে স্বাধীনতা ও অধীনতা সর্ব্ব প্রকারের বিরোধ পরিহার করিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এ দুইয়ের একতা ভিন্ন কখন ধর্ম্মের পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা নাই। পূর্ণ ধর্ম্মে বিবেক ও প্রেম, স্বাধীনতা ও অধীনতা একভাবাপন্ন। যেখানে বিবেক নাই, সেখানে প্রেম কখন থাকিতে পারে না। বিবেকবিহীন প্রেম প্রেমই নয়। যাহার বিবেক নাই তাহার প্রেম আছে, এ কথা বলিলে প্রেমের অবমাননা করা হয়। হৃদয় শুষ্ক না

হইলে স্বার্থের গন্ধ যায় না, স্বার্থের গন্ধ না গেলে প্রেমের উদয় হইবে কি প্রকারে? যাহার স্বার্থ আছে সে কি কখন আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারে? সে যাহা করে আপনার জন্যই করে। যে ব্যক্তিতে বিশুদ্ধ প্রেম আছে, তাহাতে বিবেক থাকিবেই থাকিবে। বিবেক সকল প্রকার প্রবৃত্তি বাসনার বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত করে; এই মুক্তভাবই স্বাধীনতা। সুতরাং স্বাধীনতা বিবেকমূলক। যদি এক ব্যক্তির প্রবৃত্তি বাসনা চলিয়া গেল, তাহা হইলে তাহাতে স্বার্থের তিরোধান এবং প্রেমের আবির্ভাব অনিবার্য্য। এ অবস্থায় কি হয়? "জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়।" প্রেম কি না কল্যাণ চায়, তাই আপনাকে ভুলিয়া গিয়া যখন উহা পরের কল্যাণ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কল্যাণও অনুস্যূত হইয়া যায়। মানিলাম বিবেক আমাদিগকে প্রবৃত্তি বাসনা হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিল; এই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নিস্বার্থভাব উপস্থিত হওয়াতে আমাদিগের মধ্যে প্রেমের উদয় হইল; কিন্তু প্রেমের উদয়ে অধীনতার উদয় ইহা কি প্রকারে আসিতেছে? আসিতেছে এই জন্য যে, প্রেম সকল প্রকারের প্রভুত্বের চেষ্টা ছাড়িয়া দেয়, কেবলই প্রণত হইয়া অপরের সেবা করে। "প্রভুত্বের চেষ্টা আপনার দিক্ রক্ষা করে; দাসত্বের চেষ্টা পরের মঙ্গল চায়।" প্রেমের ভিতরে আপনাকে অস্বীকার এবং পরকে সর্ব্বস্ব করা রহিয়াছে। আপনাকে অস্বীকার করিয়া পরকে সর্ব্বস্ব করিলেই প্রভুত্ব গেল দাসত্ব আসিল, দাসত্ব আসিলেই অধীনতা অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। আপনাকে অস্বীকার করিয়া পরকে সর্ব্বস্ব করা নারীজাতির প্রকৃতি। পত্নী আপনাকে অস্বীকার

করিয়া স্বামীর সহিত এক হইয়া যান, স্বামীর কল্যাণার্থ আপনার জীবন মন সমর্পণ করেন, অধীনতা তাঁহার জীবনের ব্রত হয়। এ অধীনতাকে কে নিন্দা করিবে? এ অধীনতার নেতা যে স্বামীর কল্যাণ। কল্যাণ অধীনতার নেতা, এজন্য এখানে আপনার ইচ্ছা স্বামীর ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা তিন এক হইয়া যায়। নারীতে বিবেকের কঠোর ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, এ জন্য তাঁহাতে বিবেকের অভাব সাব্যস্ত করিতে পারি না। তাঁহাতে প্রেম ও বিবেক এমনই মিশিয়া গিয়াছে যে, প্রেমের কোমলতা সর্ব্বদা সকলের নয়নগোচর হইলেও প্রবৃত্তি বাসনার বিরুদ্ধ পথে গতি নারী যেমন দৃঢ়তার সহিত অবরুদ্ধ রাখেন, এমন পুরুষের করিবার সামর্থ্য নাই। নারী স্বভাবতঃ পুণ্যময়ী, সুতরাং তাঁহাতে প্রথম হইতে প্রেমের প্রকাশ অনিবার্য্য তাঁহাকে কাহার বিবেকসম্ভূত শুদ্ধতা শিক্ষা দিতে হয় না, তাঁহার স্বভাবের মূলে শুদ্ধতা সর্ব্বদা বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্য ভক্তির অবতার। প্রেম তাঁহার জীবনের মূল উপাদান। তিনি বিন্দুমাত্র শুদ্ধতার ক্ষতি সহ্য কবিতে পারিতেন না। তিনি নারীভাব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাই শুদ্ধতার প্রতি তাঁহার ঈদৃশ সুকোমল অনুরাগ ছিল। বিবেক পুরুষ, প্রীতি নারী, এ দুইয়ের সম্মিলনে শুদ্ধ প্রেমের উদয়। ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বত্যাগী প্রেমিক প্রকৃতির ভাব স্বীকার করেন, এ জন্য ছোট হরিদাসকে শ্রীচৈতন্য যখন বর্জ্জন করেন, তখন তাহার কারণ তিনি এই প্রদর্শন করিয়াছিলেন,

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
প্রভু বলে তার মুখ না করোঁ দর্শন॥

একাধারে যেখানে নরনারীপ্রকৃতি মিলিত হয় নাই, সেখানে প্রেমের উদয় হইতে পারে না; সর্ব্বথা জগৎ, জীব ও ঈশ্বরের অধীনতা উপস্থিত হয় না; পুণ্য পবিত্রতার সাম্রাজ্য বিস্তার হয় না। কেশবচন্দ্র 'একাধারে নরনারীপ্রকৃতি' বিষয়ে উপদেশ দানকালে বলিয়াছেন, * "তিনি (শ্রীচৈতন্য) একাধারে রাধা কৃষ্ণের মিলন, যোগ ভক্তির ঐক্য, প্রেম পুণ্যের যোগ, এবং নরনারীর বিবাহ, অনুরাগ বৈরাগ্যের মিলন দেখাইলেন।" "পৃথিবীতে পুরুষ নারীকে বিবাহ করে, নারী পুরুষকে বিবাহ করে; কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে পুরুষ আপনাকে বিবাহ করে, নারী আপনাকে বিবাহ করে, এই যে নরনারী আপনাকে আপনি বিবাহ করে, ইহাই স্বর্গীয় বিবাহ। এই স্বর্গীয় বিবাহপ্রথা অনুসারে চৈতন্য নিজেই নিজের স্ত্রী হইলেন।" "ঘরের বিষ্ণু-প্রিয়া এখন সন্ন্যাসীর বিষ্ণুপ্রিয়া হইলেন। চৈতন্য দেখিলেন তিনি স্ত্রীপ্রকৃতি ভক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ভক্তচূড়ামণি আপনার ঐ প্রকৃতিকে আপনি বিবাহ করিলেন।" এই আধ্যাত্মিক বিবাহে বিবেক ও প্রেম, স্বাধীনতা ও অধীনতা এক হয়।

স্বাধীনতাতে মন আপনার ভিতরে বদ্ধ থাকে, অধীনতাতে উহা প্রমুক্ত ভাবে সকল নরনারীকে আলিঙ্গন করে। জগতের কল্যাণের অধীন হইলে কি আর মানুষ আপনাতে আপনি বদ্ধ থাকিতে পারে? কেশবচন্দ্র ভালই বলিয়াছেন, "ধন্য ঈশা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাসী, যাঁহারা একটি মার পরিবর্ত্তে সহস্র

---

* বক্তৃতাকালে ভাবতঃ যাহা উল্লিখিত হইয়াছিল এখন তাহা স্থানে স্থানে উপদেশাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

ম্নাকে বরণ করেন, সমস্ত পৃথিবীকে ভাই ভগিনী মনে করেন এবং দুই একটি অতিথির পরিবর্ত্তে হৃদয়গৃহে সহস্র সহস্র অতিথির সেবা করেন। যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি ছোট সংসারের সঙ্গে এক প্রকাণ্ড সংসার যোগ করেন, এক খানি ঘরের পরিবর্ত্তে তিনি কোটি কোটি ঘর এবং অল্প কয়েক জন বন্ধুর পরিবর্ত্তে অসংখ্য ভাই ভগিনী লাভ করেন।" সন্ন্যাসী কে? যিনি সমুদায় ঈশ্বরের জন্য, অপরের জন্য অর্পণ করিয়াছেন। এরূপ অর্পণ অধীনতা বিনা কোন কালে সম্পন্ন হয় না, অধীনতা ও প্রেম এ জন্য চিরসংযুক্ত। এখন কথা হইতেছে, জগতের কল্যাণের অধীন হইলে কোন মানুষ বা মানুষ-সমূহের অধীন হওয়া হইল না, কেবল এক কল্যাণরূপী ঈশ্বরের অধীন হওয়া হইল; কিন্তু কেশবচন্দ্র যে অধীনতার ব্রত দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের এবং দলের অধীনতা-স্বীকার রহিয়াছে, এখানেও কি এ অধীনতাকে প্রেম বলিতে হইবে? তিনি যখন প্রচারকবর্গকে ব্রত দিলেন, তখন আচার্য্যের এবং পরস্পরের অধীন হইবার প্রতিজ্ঞায় তাঁহাদিগকে বদ্ধ করিলেন। "অধীনের দল এখানে নয়" এ কথার সঙ্গে তাঁহার মিল থাকিল কোথায়? তিনি যে প্রচারকগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া একটি অধীনের দল প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। কেবল পরস্পরের অধীন হইতে নহে নিজের অধীন হইতেও কেশবচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছেন, ইহাতে কি পোপের অধিকার গ্রহণ করিবার অভিলাষ তাঁহাতে প্রকাশ পাইতেছে না? "দলের কেহই অধীনতায় জীবিত নহেন, কিন্তু স্বাধীনতায়। আমি কাহাকেও যাঁতায় পেষণ করিতে মানস করি না

প্রত্যেককে স্বাধীন দেখিতে চাই। কাহাকেও গুরু অথবা শাসনকর্ত্তা বলিতে বলি না, ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া জানি।" এ সকল কথা এখন কোথায় রহিল? আপনার এবং পরস্পরের অধীন করিবার জন্য এত প্রয়াস কেন? স্বাধীনতায় জীবিত থাকিতে না দিয়া অধীনতায় জীবিত রাখিবার জন্য যত্ন কি ব্যর্থ যত্ন নহে? "এ দলের কেহই অধীন হইবেন না" এ কথা এখন তিনি বিস্মৃত হইলেন কেন? এত বলের সহিত স্বাধীনতা প্রচার করিয়া পরে আবার অধীনতার গুণব্যাখ্যা অধীনতাপ্রবর্ত্তনে প্রবৃত্তি, ইহা কি স্ববিরোধিতা নয়? স্ববিরোধিতা নয়, ইহার মধ্যে সু-অবিরোধিতা আছে, ইহাই দেখা প্রয়োজন। আচার্য্য এবং পরস্পরের অধীন হইব, এ প্রতিজ্ঞার কি এই অর্থ নহে যে, আচার্য্যের প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি প্রেমে সর্ব্বথা আপনাকে উড়াইয়া দিব? যদি এ অর্থ হয়, তবে কেশবচন্দ্র এ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিয়া কিছু স্বাধীনতাকে উড়াইয়া দেন নাই। যাহারা স্বাধীন নহে স্বার্থের অধীন, তাহারা কি কখন এ প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারে? যদি প্রচারকগণ জীবনে এ প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তাহার কারণ অস্বাধীনতা বা স্বার্থাদির অধীনতা, স্বাধীনতা নহে। এ দিক্ দিয়া না দেখিয়া অন্য দিক্ দিয়া দেখিলেও সু-অবিরোধিতা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। আচার্য্য এবং পরস্পরের অধীনতা সংসারের অনুরোধে, না ধর্ম্মের অনুরোধে? যদি ধর্ম্মের অনুরোধে হয়, তাহা হইলে সেখানে সত্য থাকিবে, সত্যের প্রতি অনুরাগ থাকিবে। আচার্য্য ও পরস্পরের সহিত সাংসারিক সম্বন্ধ না হইয়া ধর্ম্মের সম্বন্ধ হইলে এ সম্বন্ধ বন্ধনের কারণ হইবে না, মুক্তির কারণ হইবে। কেন

না এই সম্বন্ধ হইতে সত্যের আগম হইবে, সত্য সকলকে স্বাধীন করিবে। আচার্য্য হইতে যে নব নব সত্যের নিত্য আগম হইত তৎপ্রতি অনুরাগ বা প্রেম যদি অধীনতার কারণ হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতার বিলোপ হইল কোথায়? বরং উহা বাসনা প্রবৃত্তি স্বার্থ তিরোহিত করিয়া স্বাধীনতা আরও দিন দিন বর্দ্ধিতই করিবে আগম শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজাননে।
মতশ্চ হৃদয়াম্ভোজে তস্মাদাগম উচ্যতে॥

ঈশ্বর হইতে এক ব্যক্তির নিকটে সত্য আসিল, সে সত্য অন্য দশ জনের হৃদয় অনুমোদন করিল, তখন সত্যের আগম হইয়াছে বুঝা গেল; কেশবচন্দ্র সত্যের আগমসম্বন্ধে কি এইরূপ কথা বলেন নাই? তিনি আপনি বলিয়াছেন, "আমি কি ইচ্ছা করি যে, আমি এই সকল বলিলাম বলিয়া তোমরা গ্রহণ করিবে? কখন নয়, আমি বিচারিত হইতে অভিলাষ করি। আমার মত সমুদায় সুতীক্ষ্ণ বিচারের অধীন হউক। গৃহে গমন কর, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, পরিতুলিত কর; আমি যে সকল মূলতত্ত্ব স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিলাম তাহার প্রত্যেকটি যত্ন সহকারে চিন্তা করিয়া দেখ, তৎপর যে কোন সত্য ঈদৃশ একান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে সেইটি গ্রহণ কর, যিটি ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেটিকে অগ্রাহ্য কর। আমার ওষ্ঠাধর হইতে যে কোন কথা বিনিঃসৃত হয় তাহা আমার স্বদেশীয়গণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে না যদি তাঁহাদের অন্তরস্থ পরমাত্মা কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হয়।" তিনি আপনার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন মণ্ডলীর নেতৃবর্গ-সম্বন্ধে তাহাই সত্য। কেশবচন্দ্রকর্ত্তৃক নিবন্ধ ঈশ্বরের কথোপকথনে

আছে, "যদি তোমাদের নেতৃগণ তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, তোমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে আমাকর্তৃক অনুমোদিত না হইলে তাহাদের জ্ঞান গ্রহণ করিও না।" কেশবচন্দ্র আপনি কি প্রার্থনা করেন নাই, "যার ভিতর দিয়া কথা বলিবে আমি তার পাদপদ্মে প্রণাম করিব। স্বর্গরাজ্যের কথা যার ভিতর দিয়া প্রেরণ কর আমরা নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিব।" কিন্তু ঈশ্বরের কথা আসিল বুঝিব কি প্রকারে? "তারে কি খবর এলো বিবেকের ভিতর দিয়া শুনিতে হইবে।" সুতরাং বিবেক বা তন্মূলক স্বাধীনতা না থাকিলে সত্য বুঝিবার বা গ্রহণ করিবার কোন উপায় নাই। আপনি প্রত্যাদিষ্ট না হইলে সমাগত সত্য বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারে কাহার সাধ্য? এই সত্যই কেশবচন্দ্র প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "যখন পবিত্রাত্মা দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হই, তখন মাচ কথা কয়, গাছ কথা কয়, ইন্দুর ছুঁচো স্বর্গরাজ্যের সংবাদ আনে।" স্বাধীন আত্মা পবিত্রাত্মার আবাসভূমি, এবং পবিত্রাত্মা আমাদিগকে সত্যের প্রতি অনুরাগ ও অধীনতা বা শিষ্যপ্রকৃতি শিক্ষা দিয়া থাকেন। আচার্য্যের ভিতর দিয়া যে সত্য আসিল তৎপ্রতি অনুরাগ ও তদধীনতাই আচার্য্যের অধীনতা। সুতরাং ইহা অন্য কথায় ঈশ্বরাধীনতা।

আচার্য্যের অধীনতার কি অর্থ, এবং তন্মধ্যে যে স্ববিরোধিতা নাই প্রদর্শিত হইল, এখন পরস্পরের অধীনতাসম্বন্ধে যে বিশেষ কথা আছে তাহা বলিতে যত্ন করা যুক্তিক। ধর্ম্ম, সত্য ও ঈশ্বরের নামে যাঁহারা একত্র হন, তাঁহারা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট মণ্ডলী। এই মণ্ডলীকে আমরা কখন সামান্য দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না, ইহা পবিত্রাত্মার আবাসভূমি। খ্রীষ্টশাস্ত্রে ঈশাকে বর, এবং মণ্ডলীকে কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ উপমাটী অতি সুন্দর।

বর ও কন্যার সহিত যেমন অভিন্ন যোগ ঈশা ও মণ্ডলীর সহিত তেমনি অভিন্ন যোগ। খ্রীষ্টশাস্ত্রের এ উপমা ছাড়িয়া দিয়া আমরা অন্য দিক্ দিয়া ঈশা বা ঈশ্বরতনয় ও মণ্ডলীকে একেবারে এক বলিয়া উপস্থিত করিতে পারি। মণ্ডলী পবিত্রাত্মজাত ঈশ্বর-তনয়। তিনি যাহা বলেন, যে বিচার করেন, তাহা পুত্রের বলা, পুত্রের বিচার। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরতনয় ঈশা জুডিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন তিনি নাই, ঈদৃশ ঈশ্বরতনয় আমাদের বিশ্বাসভাজন নহেন; তিনি আমাদিগের নিকটে আমাদের সম্মুখে আছেন। কি ভাবে আছেন? কিরূপে আছেন? সাধকগণের মিলিতভাবমধ্যে আছেন, মণ্ডলীরূপে আছেন। ঈশা বলিয়াছেন, তাঁহার উপরে ঈশ্বর বিচারের ভার দিয়াছেন, তিনি আসিয়া সকলের বিচার করিবেন। তাঁহার শিষ্যগণ বহু দিন হইল প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, কৈ তিনি তো বিচার করিতে আসিলেন না! তাঁহার শিষ্যেরা মনে করিয়াছিলেন, তিনি পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া ধরাধামে আসিবেন, সিংহাসনে বসিয়া সকল জাতির বিচার করিবেন। যাঁহারা এরূপ ভাব মনে স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহারা ঈশার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়া-ছিলেন, "আমার নামে যেখানে দুই জন বা তিন জন একত্র হয়, তাহাদের মধ্যে আমি বিদ্যমান।" এই বিদ্যমানতা লক্ষ্য করিয়াই তিনি বিচার করিতে আসিবেন বলিয়াছিলেন। কেন না তাঁহার নামে যাঁহারা মিলিত, তাঁহারা যে বিচার করেন স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাহা দৃঢ়তর থাকিবে, এ কথা বলিয়া তিনি বিচারের ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা আপনি সুস্পষ্ট বলিয়া গিয়া-ছেন। এখন এই সকল কথার আলোকে বিচার করিয়া দেখিলে

পরস্পরের অধীন হইবার জন্য কেশবচন্দ্র প্রচারকগণকে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ কেন করিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। প্রেমে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অধীন হইবেন, ইহা সর্ব্ব প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা এই যে, পরস্পরের শাসন মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারা পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করিবেন। এ অধীনতা এত দূর যে তাঁহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, তিনি অমুক বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ সকলে যদি সেই বিষয়ে তাহার বিপরীত আদেশ পান, তাহা হইলে কোন কথা না বলিয়া আপনাকে ভ্রান্তজ্ঞানে সকলে যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকে সেই আদেশের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে *। প্রতিব্যক্তিকে মণ্ডলীর নিকটে এইরূপে প্রণত হওয়া যখন বিধি, তখন পরস্পরের অধীনতা স্বীকারের প্রতিজ্ঞা কখন বিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। মণ্ডলীস্থ প্রতিব্যক্তি মণ্ডলীর শাসনবিধির অধীন হইবেন, ইহা

---

* ১৭৯৭ শকের আষাঢ় মাসে অধীনতাব্রতসম্বন্ধে উপদেশ হয়, শ্রাবণ মাসে প্রচারকসভায় নিয়ম হয় "বিধাতা হইতে সমাগত আদেশ বিধানস্থ সকলের নিকট এক সময়ে একই প্রকারে আসিবে, ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্নরূপে আসিবে না। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রান্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন নির্দ্ধারণ ব্যক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও এই জন্য তাহা বিনা প্রশ্নে মানিতে হইবে।" এই সময় প্রচারকগণ অধীনতব্রতসাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই বিধান যে ইহার পূর্ব্ব হইতে ছিল এক বৎসরের পূর্ব্বের লিপিতে তাহা আমরা দেখিতে পাই। (২৫শে শ্রাবণ ১৭৯৬ শক) "প্রচারকেরা এই সভার অধীন, যদি কেহ কখন এই সভার শাসন অতিক্রম করিয়া বিপথগামী হন, তিনি ইহার কোন বিধান আক্রমণ করিতে পারিবেন না।" এ সম্বন্ধে প্রচারকগণ আপনাদিগকে অঙ্গীকারপাশে বদ্ধ করেন।

প্রতিজ্ঞা করিয়া যখন তাঁহারা মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা সে অঙ্গীকার কখন ভঙ্গ করিতে পারেন না। মণ্ডলী তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচারকপদে প্রতিষ্ঠিত। মণ্ডলী যে বিচার করিবেন সে বিচার স্বর্গে ও পৃথিবীতে সুদৃঢ় থাকিবে। মণ্ডলীকে অগ্রাহ্য করিয়া কেহ স্বর্গে গমন করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। "বুঝিতে পারিতেছি না তথাপি অধীন হইব, ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পারে তথাপি অধীন হইব," সমবেত সাধকগণের প্রতি এরূপ দৃঢ় নিষ্ঠা যিনি পোষণ করেন না, তিনি কখন ধর্ম্মসমাজে থাকিবার যোগ্য হইতে পারেন না। আপনাকে যিনি সাধকগণমধ্যে উড়াইয়া দেন নাই, তাঁহার দ্বারা প্রেম-পরিবার সংস্থাপিত হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? "প্রেমব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, এক মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাঁচজনের মধ্যেও মিল হইবে, সকল প্রকারের কলহ, বিবাদ, অপ্রণয় তিরোহিত হইবে"; আপনাকে সকলের ভিতরে উড়াইয়া না দিলে এ সত্য কি এ সংসারে প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে? আপনাকে বজায় রাখিয়া কোন দিন প্রেম হয় নাই, হইতে পারে না, এই জন্য 'অধীনতা ব্রতের' অপর নাম 'প্রেমব্রত'।

কেশবচন্দ্রের কথা বলিতে গিয়া আত্মকথা বলা যদিও শোভা পায় না, তথাপি কেশবচন্দ্র যে মূলতত্ত্ব স্থাপন করিলেন তাঁহার অনুগামী বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ তাঁহারা তাঁহার সেই মূলতত্ত্ব কত দূর আপনাদের জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন পৃথিবী ইহা জানিতে চায়। আমার সম্বন্ধে মণ্ডলীমধ্যে একটি অপবাদ প্রচলিত আছে, সে অপবাদকে আমি আমার সম্বন্ধে শ্লাঘা

মনে করিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে অনেকে এই কথা বলেন, আমার আপনার বলিবার কোন মত নাই; আমি আত্মমতে চলি না পরের মতে চলি। এটী আমার নিতান্ত দুর্ব্বলতা, ইহা সকলের সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমি এটীকে দুর্ব্বলতা মনে করি না, আমার জীবনে ইহাতেই বলাধিষ্ঠান। কোন একটি বিষয় উপস্থিত হইলে তৎসম্বন্ধে আমার কোন মত নাই, ইহা মনে করা সত্য নহে, সে সম্বন্ধে আমি আমার মত পশ্চাতে রাখিয়া দি, তৎসম্বন্ধে মিলিত সাধকগণের মত কি তাহাই জানিবার জন্য উৎসুকচিত্ত হই। যদি তাঁহাদিগের মতের সহিত আমার মত মিলে (অনেক সময়ে এইরূপই ঘটিয়া থাকে) আমি আনন্দিত হই, যদি না মিলে আমার মত উড়াইয়া দিয়া তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তন করি। কোন এক ব্যক্তির সহিত আমার মতের অনৈক্য হইলে আমি আত্মমতে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকি, কখন তাঁহার মতের অনুবর্ত্তন করি না, কেন না সমবেত সাধকগণের মতে আত্মমত বিসর্জ্জন করিতে আমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট। সমবেত সাধক বলিতে আমি বিধানান্তর্গত ব্যক্তিগণকে বুঝি। প্রেরিতবর্গের সন্নিধানে আমার মস্তক চির অবনত, কিন্তু তাহা বলিয়া আমি তদতিরিক্ত সাধকগণের নিকটে মস্তক অবনত করি না তাহা নহে। সর্ব্ববিষয়ে প্রেরিতমণ্ডলীর অধিষ্ঠানভূমি শ্রীদরবারের অধীনতা স্বীকার আমার জীবনের ব্রত, কিন্তু ভারতের নানা স্থানে বিধানান্তর্গত যে সকল ব্যক্তি আছেন, আমি যখন তাঁহাদের সেবা করিতে যাই, তখন তত্রত্য মণ্ডলীর অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকি। আমি কাহারও প্রভু নই, সকলে আমার প্রভু, ঈশ্বরকৃপায় যত দূর

সাধ্য এই সত্য প্রতিপালনে যত্ন করি। অধীনতাব্রতকে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত মনে করি, এই ব্রতে যেন চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি, ইহাই আমার হৃদয়ের প্রার্থনা। কোন এক ব্যক্তির সম্বন্ধে বিচার করিবার অধিকার সমবেত সাধকগণের, এ বিধি কেশবচন্দ্র অতি যত্নের সহিত পালন করিতেন। "কোন ব্যক্তির বিচার করিতে আমি নাই" এ কথা যে তিনি মুখে বলিয়াছেন, তাহা নহে, বাস্তবিকই তিনি আপনি কখন কাহারও বিচারের ভার গ্রহণ করেন নাই। বিচারের বিষয় উপস্থিত হইলে তিনি প্রচারকগণের সভায় (পর সময়ে শ্রীদরবারে) উপস্থিত করিতেন, আপনি তৎসম্বন্ধে কিছু করিতেন না। এক সময় একটি অত্যন্ত ক্লেশাবহ বিচারের বিষয় উপস্থিত হয়। জনসমাজের নিকটে গোপন করিয়া সে বিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য ছিল, সুতরাং একা বিচার করিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইত, কিন্তু তিনি একা বিচার করিতে পারেন না বলিয়াই সকলকে প্রচারকসভায় সমবেত করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে বিষয়টি উপস্থিত করিলেন এবং তৎসম্বন্ধে যাহা বিহিত করিবার ভার প্রচারকবর্গ হইতে আপনি গ্রহণ করিলেন। বিচারসম্বন্ধে যেমন তেমনি প্রচারকসভায় উপস্থিত বিষয়সম্বন্ধেও তাঁহার অধীনতাস্বীকার ছিল। কোন বিষয় সভায় উপস্থিত করিয়া সভাস্থ এক জনেরও মত না পাইলে তিনি নিবৃত্ত হইতেন। তাঁহার এই অধীনতাস্বীকার যদি আমার জীবনে অক্ষুণ্ণ থাকে, আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

স্বাধীনতা ও অধীনতা এ দুই সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা ঘটে নাই সু-অবিরোধিতা ঘটিয়াছে, ইহা এক প্রকার

দেখান হইল, এখন তাঁহার দ্বিতীয় অনুসর্ত্তব্য মূলতত্ত্ব সমতা-সম্বন্ধে স্ববিরোধিতা ঘটিয়াছে কি না বিচার করিয়া দেখা যাউক। সাম্যের বিরোধী বৈষম্য। যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার আপনার সহিত অপরের সমতা তিনি স্বীকার করেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের মূলতত্ত্ব সমতা ছিল প্রতিপন্ন হয় না। তিনি যে বিধান প্রচার করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বর-দর্শনপ্রধান। যাঁহাদের ঈশ্বরদর্শন হয় না, অথবা যাঁহারা বলেন ঈশ্বরদর্শন হয় না, তাঁহারা এ বিধানের লোকমধ্যে গণ্য নহেন। সকলের পক্ষেই ঈশ্বরদর্শন সম্ভব, এই কথা প্রচার করিয়া যদি কেশবচন্দ্র বলিয়া থাকেন "আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্য করে," তাহা হইলে তিনি আপনার কথা আপনি খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহাতে স্ববিরোধিতা দোষ উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্বাসিমাত্রেই ঈশ্বরকে দর্শন করেন, এ কথা বলিয়া তিনি আবার বলিলেন, আমার মাকে কি তোমরা দেখিয়াছ? বন্ধুবর্গের প্রতি ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ প্রকাশ কেন? 'আমার মা' এরূপ বলিবারই বা অর্থ কি? তাঁহার মা এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের মা এক নহেন, ইহাই কি তিনি ইহার দ্বারা বলিতেছেন না? এক স্থানে যদি এরূপ একটী কথা তিনি বলিতেন, তাহা হইলে মনে হইত, হঠাৎ এরূপ কথা মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু এরূপ বৈষম্য এরূপ প্রভেদ তাঁহার অস্থিগত ছিল, ইহা মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে। তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, আমার হরি সত্য হরি, আর সকলের হরি ঝুঁটো হরি। সেই সকল ঝুঁটো হরিকে বিনাশ করিয়া সত্য হরির সাম্রাজ্য যাহাতে স্থাপিত হয়, তাহার জন্য

তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন। এ সকল কথায় আপনাকে বাড়াইয়া অপর সকলকে কি অধঃকরণ করা হয় নাই? তাঁহার হরি সত্য আর সকলের হরি ঝুঁটো এ কি প্রকারের কথা। ইহা যদি বৈষম্য না হয়,তাহা হইলে বৈষম্য আর কাহাকে বলে? এ আবার কিন্তু সামান্য বিষয় লইয়া বৈষম্য নয়, একেবারে ধর্ম্মের মূল লইয়া বৈষম্য। এখন দেখা যাউক এই বৈষমের মধ্যে সাম্য আছে কি না? 'আমার মা' 'আমার হরি' বলিয়া অপরের মা অপরের হরি হইতে কেশবচন্দ্র আপনার ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র করিলেন কেন? প্রাচীন ও নূতন এ প্রকারে বিভাগ না করিয়া ধর্ম্মের ইতিহাস কখন পাঠ করা যাইতে পারে না। ঈশ্বর চিরদিনই এক, তাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু মানবের নিকটে তাঁহার প্রকাশ এক প্রকার নয়। কেশবচন্দ্র তাঁহার একটী প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "তোমার বিস্তীর্ণ দরবারে বসিয়া ভাই বন্ধু সকলে মিলে তোমার পূজা করিতেছি। আগে তুমি যেমন ছিলে তেমনি রয়েছ কি না বল; অর্থাৎ আগে আমরা তোমাকে যেমন দেখিতাম তেমনি করিয়া দেখি কি না বল। ঈশ্বর আছেন, তিনি তো চিরকাল সমান, কিন্তু প্রাপ্ত ঈশ্বর তিনি কি সমান? তবে ধর্ম্মকর্ম্ম যাক্, আর কিছু চাই না। এমন গরিব এমন নাস্তিক হইলাম এত দিনে? এমন দুর্দ্দশা দুর্গতি আমাদের? তুমি সমান? তবে তুমি যাও। তুমি বল আমার হরি, এই কথাটী সহজ করে বল যে, যা ছিলে তুমি তাই কি না? তোমার সম্বন্ধে তুমি তাই থাক আপত্তি নাই। যদি না থাক আপত্তি আছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি সমান থাক, আমার দ্বারা লব্ধ হরি যদি চিরকাল সমান থাক, তবে আমার মরা ভাল।" এই কথা গুলি ভাল

করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে মাতে মাতে প্রভেদ হরিতে হরিতে প্রভেদ কেন হয় তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। মা চিরদিন যেমন তেমনি আছেন, হরি যেমন চিরদিন তেমনি আছেন; কিন্তু আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নরনারী কি সমান ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছে? তাহাদিগের গ্রহণসামর্থ্য অনুসারে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিয়াছে। অনেক দূরে যাইতে হয় না, য়িহুদিগণের যিহোবা এবং ঈশার পিতা, এ উভয়ের মধ্যে কত তারতম্য। অসভ্য বর্ব্বর জন্তু যে ভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সভ্যতার উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় ব্যক্তিগণ কি সেই ভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করেন? এক সম্প্রদায়ে ঈশ্বরের ভাব যে প্রকার অন্য সম্প্রদায়ে ঈশ্বরের ভাব তাহার বিপরীত। এই ভাবের প্রভেদবশতঃ সম্প্রদায়ভেদ হইয়া পড়িয়াছে। খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব একত্র মিলিতে পারেন না কেন? কেবল বিজাতীয় বলিয়া মিলিতে পারেন না তাহা নহে। উভয় ধর্ম্মের বিষয় যাঁহারা বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহারা এ দুইয়ের মধ্যে এত পার্থক্য দেখেন যে, এ দুইকে কিছুতেই এক করিতে পারেন না। আমরা সকলে এক সময়ে বাস করিতেছি, আশা করা যাইতে পারে যে, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের ভাবসম্বন্ধে একতা থাকিবে। কিন্তু একই সময়ে একই শিক্ষাধীনে থাকিয়া ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের ভাবের কত তারতম্য! এক অখণ্ড ঈশ্বর বুদ্ধিভেদে খণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছেন, নানা জন তাঁহাকে নানা ভাবে গ্রহণ করিতেছেন। এই বুদ্ধিভেদ নিবারণ করিয়া এক অখণ্ড ঈশ্বরকে গ্রহণ করা কেশবচন্দ্রের জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য। তিনি আপনি অখণ্ড ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া খণ্ড ঈশ্বর ঈশ্বর

নহেন, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন, আমার হরি সত্য হরি, আর সমুদায় ঝুঁটো হরি। এ কথা বলাতে প্রতি-মনুষ্যের ঈশ্বরদর্শনে সামর্থ্য তিনি অস্বীকার করিতেছেন না, কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে ভ্রান্ত জ্ঞান দূরে পরিহার করিয়া সত্য ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ঈশ্বরদর্শনে সামর্থ্য কেশবচন্দ্র এবং আর সকলের সমান ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। কিন্তু লোকে আলস্য জড়তার অধীন হইয়া ঈশ্বরদর্শনের জন্য আপনাদের সমুদায় হৃদয় মন প্রাণ সমর্পণ করে না এই জন্য সত্য ঈশ্বর তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ পান না, এই তাঁহার এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য। তিনি ঈশ্বরের মাতৃভাব যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার বন্ধুগণ প্রাচীন ভাবের সহিত এখনও সংযুক্ত আছেন বলিয়া সেরূপ উপলব্ধি করেন নাই, এই জন্যই বলিয়াছেন, "আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্য করে।" তাঁহার মাকে তাঁহার বন্ধুগণ কখন দেখিতে পাইবেন না, এরূপ বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু সকলে একই মাকে দর্শন করুন, এই বাসনা হইতে এ কথা তাঁহার হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছে। সকলে মিলিয়া এক সত্য হরি, এক সত্য মাকে দর্শন করিবেন, এই চেষ্টায় তিনি দেহপাত করিলেন। এ সম্বন্ধে কেহ তাঁহাতে বৈষম্য আরোপ করিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব।

এই ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে আর এক দিক্ দিয়া কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা আছে, অনেকে বলিতে পারেন। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরদর্শনে মধ্যবর্ত্তিতা অস্বীকার করিয়াছেন, আবার বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ই তোমরা পুত্রের মধ্য দিয়া বিনা পিতার নিকটে পৌছিতে পার না।

এই অবশ্যম্ভাবী যুক্তিযুক্ত মধ্যবর্ত্তিতা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।" কি বিপরীত কথা! ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ নব ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ, অথচ সেই প্রাণ কেশবচন্দ্র আপনি বিনষ্ট করিতে উদ্যত। ইহা যদি স্ববিরোধিতা না হয়, তাহা হইলে স্ববিরোধিতা আর কাহাকে বলে? ইহা আপাততঃ দেখিতে নিতান্ত স্ববিরোধী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রকৃত মত সমালোচন করিলে ইহা যে সু-অবিরোধী তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। কেশবচন্দ্র ক্রমোন্মেষ (Evolution) মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মানুষে জড়, পশু, মানব ও দেবতা পর পর স্তরে অবস্থিত স্বীকার করিতেন। মানুষ যখন নিদ্রা আলস্য ঔদাসীন্য প্রভৃতির অধীন, তখন তাহাতে জড়ের আধিপত্য। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি পশুভাব নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া জড়ের আধিপত্য নষ্ট করিতেছে, কিন্তু এই পশুভাব আবার মানবকে নীচ বাসনা নীচ প্রবৃত্তি সমুদায়ে বদ্ধ রাখিয়া তাহার মহত্ত্ব ও গৌরব হরণ করিতেছে। মানুষ পশুভাব নির্জ্জিত করিয়া মানবত্ব লাভ করে, কিন্তু ইহাতেও তাহার পূর্ণ ক্রমোন্মেষ সাধিত হইল না। নীচ পশুবৃত্তি সমুদায় যখন বিবেকাধীন হইল তখন মানবত্ব প্রস্ফুটিত হইল। মানবত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াই শেষ হইল না। যখন নীচবৃত্তি ও বিবেকের মধ্যে সংগ্রাম নিঃশেষ হইয়া বিবেকের আধিপত্য স্থাপিত হইল, তখন পুত্রের আবির্ভাব হইয়া মানবকে দেবত্ব দান করিল। কেশবচন্দ্র প্রতিমানবসম্বন্ধে এই ক্রমোন্মেষ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি যেখানে ঈশ্বরতনয়ের মধ্যবর্ত্তিতার একান্ত অপরিহার্য্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেখানে এই ক্রমোন্মেষের মত

এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—"নিশ্চয়ই মানুষের শরীর একটি প্রকাণ্ড বাণারস বাক্স। এটি একটি সুদৃঢ় জড়োৎপন্ন যন্ত্র যাহার মধ্যে মানবপশু বাস করে। এই মানবপশুর বাহিরের আবরণ উন্মোচন কর মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইবে। আর একটু গভীর প্রদেশে প্রবেশ কর মনুষ্যত্বের ভিতরে ঈশা আবৃত রহিয়াছেন দেখিতে পাইবে। দেখ! ঈশার ভিতরে পবিত্রাত্মা লুকায়িত, সেই পবিত্রাত্মার গম্ভীর প্রদেশে গমন কর, তুমি অবশেষে অদৃশ্য মহান্ সার সত্য যিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। মানুষ এবং ঈশ্বরের ভিতরে খ্রীষ্ট কি তবে মধ্যগত যোগশৃঙ্খল নহেন? প্রত্যেক মানবের আত্মার গভীরতম স্থানে মহান্ ঈশ্বর বিদ্যমান। কিন্তু যে বিশুদ্ধ পুত্রত্বে গূঢ় ঈশ্বরনিলয় পরিবৃত, তন্মধ্য দিয়া না গেলে সে নিলয়ে যাইতে পারা যায় না। প্রতিব্যক্তিতে পুত্রের যে চরিত্র ও ভাব নিহিত আছে তাহার মধ্য দিয়া না গেলে কেহ দেবত্বে পঁহুছিতে পারে না। এই অর্থে খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যবর্ত্তী।" প্রতিব্যক্তির মধ্যে পুত্রত্ব অবস্থিত, সেই পুত্রত্ব জাগ্রৎ হইয়া না উঠিলে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাদ্দর্শন হয় না, কেশবচন্দ্র এ কথা কত স্থানে কত ভাবে বলিয়াছেন। সে সকল কথা যাঁহারা ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহারা আর এ কথা বলিতে সাহস করিবেন না যে, কেশবচন্দ্রের মধ্যবর্ত্তিত্বের মত কোন একটি বাহিরের বিষয়। আত্মাতে আমরা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু আত্মা যখন পশুভাবের অধীন তখন ধর্ম্ম আমাদিগের হইতে দূরে। যখন ধর্ম্ম পশুত্বের উপরে কর্ত্তৃত্ব লাভ করে, তখন আমরা মানবত্বের অধিকারী হই। এই মানবভাব তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার

আনুগত্য আমাদের জীবনে স্বভাবসিদ্ধ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার আনুগত্যই ঈশা বা ঈশ্বরপুত্রনামে অভিহিত, সুতরাং উহা আর আমাদের বাহিরের কোন বিষয় হইল না। আমরা যখন সর্ব্বথা ঈশ্বরের অধীন হই তখন তাঁহার আবির্ভাবে পূর্ণ হই, অন্য কথায় তাঁহাকে দর্শন করি। পুণ্যপ্রভাবাধীন আত্মার মধ্যে আমরা ঈশ্বর দর্শন করি, এ কথা বলাও যাহা, কেশবচন্দ্রের নিকট মধ্য-বর্ত্তিতার মতও তাহাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাতে স্ববিরোধিতা নাই, সু-অবিরোধিতাই আছে। কেশবচন্দ্র সহজ ভাষা অবলম্বন না করিয়া ঈশা বা পুত্রত্বকে এ স্থলে আনিলেন কেন, এ কথার বিচার এখানে না করিয়া পরে যথাস্থানে করা যাইবে।

ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে স্ববিরোধিতা সু-অবিরোধিতায় পরিণত হইল, এখন ঈশ্বরের বাণীশ্রবণসম্বন্ধে যে স্ববিরোধিতা তাঁহার উপরে অপরে আরোপ করিয়াছেন,তৎসম্পর্কীয় বিচারের অবতারণা করা যাউক। ইহার মধ্যে বিরোধিগণের প্রাচীন পত্রিকা পাঠ করা আমার প্রয়োজন হইয়াছিল,তন্মধ্যে দেখিতে পাইলাম, কেশবচন্দ্রের এক জন নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী তৎপ্রতি এই দোষারোপ করিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছেন, যত দিন তিনি জীবিত আছেন তাঁহার বন্ধুগণ কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিবেন না। কেশবচন্দ্রের প্রতি যদি এ দোষারোপ সত্য হয় তাহা হইলে সকলেই আদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে কেশবচন্দ্রের প্রকাশ্যে প্রচা-রিত এ মত গোপনে প্রচারিত মত দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে। এক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিরোধী হইয়া কেশবচন্দ্রের বিরোধে যে কথা প্রচার করিলেন, তাহা কখন সত্য নহে, ইহা আমি বলিতে চাই না; কেন না তাঁহার ঘনিষ্ঠসম্পর্কীণ লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ

এ বিশ্বাস পোষণ করিতেন এবং করেন যে, এক কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিতেন, আর কেহ ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করেন না। কেশবচন্দ্র কখন এমন কোন কথা বলিয়া থাকিবেন, যাহা শুনিয়া তাঁহাদের এ প্রকার অপ্রত্যয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিবার হেতু আছে। কারণ আমি এক জন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে, এক সময়ে কোন এক জন প্রচারক অমুক প্রদেশে প্রচার করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এই বলিয়া তথায় যাইবার ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি গোপনে কৌতুকচ্ছলে এই বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, অমুক অমুক স্থানে যাইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া এই ফল হইয়াছে যে, কেশবচন্দ্র ছাড়া অপর কেহ যে আদেশ প্রাপ্ত হন, তৎপ্রতি এ বন্ধুর আস্থা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কেশবচন্দ্র এরূপ কেন বলিয়াছিলেন, তাহার আমূল বিচার করিবার ইঁহার সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাঁহার সে কথার গভীর ভাব ইনি বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, কেবল আপনার বিশ্বাসকে চিরদিনের জন্য শিথিল করিয়া ফেলিলেন। কেশবচন্দ্রের একটী সামান্য কথায় যখন তাঁহার প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিগণের ইষ্টানিষ্ট উভয়ই হইতে পারে, তখন সত্য হউক মিথ্যা হউক, লোকের মনে তাঁহার কোন কথায় যদি কোন সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অযথাসংস্কারনিরসনের জন্য যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। কেশবচন্দ্রের আদেশসম্বন্ধে কি মত ছিল, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি এ মতে বিশ্বাস করিতেন না যে, সকলে সকল বিষয়েই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি যে কার্য্যে ঈশ্বরকর্তৃক নিযুক্ত, সেই কার্য্যে তিনি ঈশ্বরের আদেশ

প্রাপ্ত হন এই তাঁহার বিশেষ মত। চিকিৎসক চিকিৎসা কার্য্যে, শিল্পী শিল্পসম্বন্ধে, কবি কবিত্ববিষয়ে, বিজ্ঞানী বিজ্ঞান-সিদ্ধ আবিষ্কারে আদেশ প্রাপ্ত হন, কেশবচন্দ্র যদি এরূপ বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেহই আর সে বিষয়ে তাঁহার উপরে দোষারোপ করিতে পারেন না। কেশবচন্দ্র যে এইরূপই মত পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার নিজের কথাতেই ব্যক্ত আছে, সুতরাং উহা আর সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। অধ্যাত্মরাজ্যেও এক এক ব্যক্তি এক এক বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হন, কেশবচন্দ্রের ইহা বিশেষ মত। 'প্রত্যাদ্দিষ্ট' বিষয়ের উপদেশে কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "আমাদের মধ্যে এমন সকল লোক আছেন, যাঁহাদিগের হৃদয় মনের মধ্যে ঈশ্বর অবতীর্ণ; যাঁহাদিগের চরিত্রমধ্যে আমরা ঈশ্বরের ভাব বুঝিতে পারি। এই কথা দ্বারা কেহ এরূপ মনে করিও না যে, ঈশ্বর কেবল আমাদের কয়েক জনের মধ্যেই অবতীর্ণ, আর সাধারণ লোকেরা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নরকে বাস করিতেছে; তাহারা আর ঈশ্বরের কোন সত্য, কিংবা ভাব লাভ করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যা, ইহা ঘৃণিত অনৃত বাক্য। যাঁহার ভিতরে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশবায়ু ঘুরিতেছে, তিনি যে সকল বিষয়েই প্রত্যাদ্দিষ্ট হন ইহা মিথ্যা কথা। যিনি এক মাসে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, তিনি যে সকল মাসেই প্রত্যাদেশ পাই-বেন ইহা সত্য কথা নহে। অথবা যিনি এক বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান, তিনি যে সকল বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভ করেন, ইহা মিথ্যা। ......যাঁহারা ঈশ্বরের নিয়োগপত্র পাইয়া কার্য্য করেন, তাঁহা-দিগের কপালে ধক্ ধক্ করিয়া স্বর্গের জ্যোতি জ্বলিতে থাকে,

তাঁহারা আপনারাই বলেন, এই এই বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন।' যিনি যে বিষয়ে আদিষ্ট সেই বিষয় ছাড়িয়া অন্য বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ করা সমুচিত নয় কেশবচন্দ্রের এই বিশেষ মত। তিনি এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বলিয়াছেন, "তুমি ক্ষমা দ্বারা তোমার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতে আসিয়াছ, আর কিছু করিতে পার আর না পার, তুমি জগতে কেবল ক্ষমার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাও, ইহাতে জগৎ উদ্ধার হইবে। তুমি জন্ম উদাসীন, ফকীর হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছে, ঈশ্বর হইতে ফকিরী ভাব পাইয়াছ, তুমি জগৎকে কেবল সেই লক্ষণ দেখাইয়া যাও, তাহাতেই জগতের পরিত্রাণ হইবে, তোমার অন্য লক্ষণ দেখাইবার প্রয়োজন নাই।......ঈশ্বরের আদেশে যিনি গান বাঁধিতে আসিয়াছেন, তাঁহার বাদ্যে হস্ত দিবার প্রয়োজন কি? যিনি ক্ষমাচন্দ্র প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন, তিনি যেন বিনয় অথবা সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা না করেন। যিনি বিনয়ী হইতে আসিয়াছেন, তিনি স্বর্গের আর কোন লক্ষণ দেখাইতে যেন অহঙ্কার না করেন। অহঙ্কারশূন্য হইয়া আপন আপন নিয়োগপত্র দেখিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও; কেহই অনধিকার চেষ্টা করিও না।" এরূপ অনধিকার চেষ্টা কেন কেহ করিবেন না, তাহার কারণ তিনি এইরূপে দেখাইয়াছেন, "যিনি যে কার্য্যের জন্য প্রেরিত, তিনি যেন কেবল সেই কার্য্যই করেন, সেই কার্য্যসম্পর্কে ঈশ্বর দূর... তিনি প্রত্যাদেশ অথবা ঈশ্বরনিশ্বাস পাইবেন এবং পৃথিবীও সেই বিষয়ে তাঁহার অনুকূল হইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় সমুদায় দ্রব্য আনিয়া দিবে।" কেশবচন্দ্র ঈদৃশ মত প্রচার করিয়া প্রতিব্যক্তিসম্বন্ধে ঈশ্বরের

ক্রিয়া অনুষ্ঠিত ভূমির মধ্যে আবদ্ধ করিলেন, সকল ব্যক্তিই সকল হইতে পারেন ঈদৃশ মানবীয় সামর্থ্যকে খর্ব্ব করিলেন, কোন কোন ব্যক্তিকে বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন করিয়া অপর ব্যক্তিসকলকে তাঁহাদিগের হইতে হীন করিলেন, এরূপ দোষা-রোপ তাঁহার প্রতি অনেকে করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা তৎ-প্রতি এরূপ দোষারোপ করিবেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, কেশবচন্দ্র বিজ্ঞানবাদী ছিলেন, ঈশ্বর যেরূপে কার্য্য করেন তাহাই দেখিয়া তৎসম্বন্ধীয় সত্য প্রচার করিতেন, এ সম্বন্ধে লোকে আত্মাভিমানবশতঃ কি প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করে তৎপ্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, অন্যথা তিনি কখন এ কথা বলিতেন না, "কার্য্যের জন্য অহঙ্কার এবং ঈর্ষা পোষণ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিও না। তোমার পাঁচ খানি কার্য্য আছে, আমার না হয় দুই খানি কার্য্য আছে, তাহাতে আমার দুঃখের বিষয় কি? এবং তোমারই বা গৌরবের বিষয় কি? ঈশ্বর যাহাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।" জন-সমাজে যদি সকল ব্যক্তিই অমুক কার্য্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া সেই কার্য্য করিত, তাহা হইলে কি সমাজের শৃঙ্খলা থাকিত, না বিবিধ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইত? সকলেই রজক হইলে বস্ত্র ধৌত করিতে দিত কে? সকলেই ক্ষৌরী হইলে ক্ষৌর কর্ম্ম করিত কে? প্রত্যেকে এক বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হইলে ঠিক এই প্রকারই বিশৃঙ্খলা হইত। কেশবচন্দ্র তাই বলিয়াছেন, "কেহই আপনার অধিকার ছাড়িয়া অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিও না। ঈশ্বর যাহাকে যে স্থানে রাখিয়াছেন, তিনি যেন সেই স্থানেই বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সকলের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে

এখন কেশবচন্দ্রের এই সকল কথার সঙ্গে তাঁহার প্রতি যে দোষারোপ হইয়াছে, তাহার কত দূর ঐক্য বা অনৈক্য আছে ইহা দেখা উচিত। তিনি যদি তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়া থাকেন, আমি থাকিতে অপর কাহারও আদেশ পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে দেখিতে হইতেছে, তাঁহার আপনার জীবনের কার্য্যসম্বন্ধে যে সকল আদেশ পাইতেন, সেই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিয়াছেন, অথবা তাঁহার জীবিতাবস্থায় কেহ কোন প্রকারের আলোক পাইবেন না এই তাঁহার মত ছিল। এরূপ যে তাঁহার মত ছিল না তাঁহার আপনার লেখাতেই সকলে দেখিতে পাইবেন। একা কেশবচন্দ্র সকল কার্য্য করেন, আর কেহই কিছু নহেন, এই কথার প্রতিবাদে তিনি লিখিয়াছিলেন ইহা মিথ্যা কথা, ইহা ব্যর্থ তোষামোদবাক্য। তিনি আচার্য্য এ সম্বন্ধে তাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহা গ্রহণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত নহেন, কিন্তু আচার্য্যকৃত্য ছাড়া অন্য বহুবিধ কার্য্য আছে, যাহার জন্য তিনি অপরের নিকট হইতে সর্ব্বদা সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন। তিনি এ সকল কথা বলিতে গিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন "একটি অঙ্গের সম্মাননা করিও না, কিন্তু সমুদায় দেহের সম্মাননা কর।" * তিনি ঈশ্বর কর্তৃক আচার্য্যপদে

---

* Too much adulation like too much reviling is disagreeable and ought to be proscribed; specially if there is untruth or unfairness in it. The minister of the New Dispensation may justly be honored and respected as such, and any love or attachment he may win by personal influence,

প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিধানসম্পর্কীয় যে নব নব সত্য, নব নব সহব্যবস্থান, নব নব অন্তর্ব্যবস্থান লাভ ও স্থাপন করিতেন, তৎ-সম্বন্ধে অপরের হস্তক্ষেপ করা কখন সমুচিত নয়, ইহা আমি বিলক্ষণ জানি এবং এ কথা সুস্পষ্ট বলিতে আমি কুণ্ঠিত নহি, কেন না ইতিহাস আমার এ বিশ্বাস স্বয়ং সপ্রমাণ করিয়াছে। যদি ইতিহাস উহা সপ্রমাণ না করিত তবে তাঁহার নিজের কথাতেই আমি তাঁহাকে বঞ্চক বলিয়া স্থির করিতাম। "প্রত্যাদিষ্ট" এই উপদেশে তিনি আপনি বলিয়াছেন, "তুমি স্বীকার করিতেছ, মনুষ্যচরিত্র গঠন করিতে তুমি এই সংসারে আসিয়াছ। তোমার স্পর্শমাত্র কঠোর মন বিগলিত হয়, পাপা-সক্ত চিত্ত ঈশ্বরের দিকে পরিবর্ত্তিত হয় এবং অতি সহজে চরিত্র গঠিত হয়, যদি এরূপ না হয়, তুমি প্রবঞ্চক।" বর্ত্তমান বিধান-

---

will not be grudged being his due. But let him not receive more than is due to him. There are others too connected with the movement who are deserving of honor, and it would be unfair and wrong to transfer their share of the credit to the minister . . . . . It is a lie to say that the leader does everything and that he can get on without his brothers. No. Their assistance is material. They are valued auxiliaries. Their special abilities and talents for their respective fields of work, the minister does not possess. He does his work; they do theirs. Let not ignorance or flattery exclaim, he does the whole work. Such praise would not be honest. Honor not a limb; but honor the whole body, that you may glorify the God of the Church.—*The New Dispensation, May 5, 1881.*

সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের প্রত্যাদেশলাভের অতি বিস্তৃত ভূমি ছিল, সে ভূমি তিনি আপনি অধিকার করিয়া ছিলেন; অপরে সে ভূমি অধিকার করিবে, কালে অধিকার হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিবে, ইহা তিনি কোন কালে বিশ্বাস করিতেন না, অতএব তিনি জীবিত থাকিতে তাঁহার কার্য্যসম্বন্ধে কেহ প্রত্যাদেশ লাভ করিবে, ইহা যদি তিনি বিশ্বাস না করিতেন, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে তৎপ্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না, কেন না এ সম্বন্ধে তাঁহার স্থিরতর মত ছিল, এবং সে মত তিনি কোন কালে গোপন করেন নাই। কোন এক জন প্রচারক অমুক প্রদেশে প্রচার করিতে যাইতে আদেশ পাইয়াছেন ইহা বলিয়া যদি তিনি ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন, তাহাতে কেশবচন্দ্রের অপ্রত্যয় অবশ্য দোষের বিষয় অনেকে মনে করিবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে ঈশ্বরালোকে যে বিধি প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎপ্রতি যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা আর তজ্জন্য কেশবচন্দ্রে দোষারোপ করিতে পারেন না। কোন প্রচারকের কোন স্থানে প্রচারে গমন ব্যক্তিগত আলোকে নির্দ্ধারিত না হইয়া সমবেত আলোকে নির্দ্ধারিত হইবে, ইহাই স্থিরতর ব্যবস্থা। কেহ কোথাও প্রচারে যাইতে আদেশ পাইয়াছেন বলিতেছেন, অথচ তাঁহার সহযোগি-গণের তাহাতে অনুমোদন হইতেছে না; এ স্থলে সে প্রচারকের ভ্রান্তি সমুপস্থিত বুঝিতে হইবে। এমন ঘটনা প্রচারকসভায় লিপিবদ্ধ আছে, যাহাতে এক জন প্রচারক আদেশ মনে করিয়া দূরতম দেশে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সহযোগি-গণের অনুমোদন হয় নাই। এ স্থলে এইরূপ ব্যবস্থা হইত, যদি তিনি আপনার আদেশকে কার্য্যতঃ সত্য বলিয়া প্রতিপালন

করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তিগত আদেশ, আদেশ বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এ সকল বৃত্তান্ত যাঁহারা জানেন না বা বুঝেন না, কেশবচন্দ্রের কোন একটী কথাকে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অনিষ্ট হইবে, ইহা আর কিছু অসম্ভব নহে। ফলতঃ ঈশ্বরবাণীশ্রবণসম্পর্কীয় মতে কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা ছিল না, সু-অবিরোধিতা ছিল, ইহা পূর্ব্বাপর সমুদায় বিষয় ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন। কেশবচন্দ্রের সমুদায় মত বিজ্ঞানসঙ্গত, বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বন করিয়া তৎসম্বন্ধে বিচার না করিলে যেখানে সু-অবিরোধিতা সেখানে স্ববিরোধিতা প্রতীত হইবে ইহা আর একটা অসম্ভব ব্যাপার কি ?

আর একটি বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সমতা মূলতত্ত্ব একেবারে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, ইহা যে কোন ব্যক্তির মনে প্রতিভাত হইবে। তিনি অনেক স্থানে পাষণ্ড, ঈশ্বরের শত্রু প্রভৃতি শব্দ এমন তীব্রভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহাতে তিনি এ সম্বন্ধে মুসলমানগণ হইতে কিছু মাত্র ন্যূন ছিলেন, ইহা মনে হয় না। কতকগুলি লোক ঈশ্বরের প্রিয়, কতকগুলি লোক ঈশ্বরের অপ্রিয়, কতকগুলি লোক তাঁহার সুহৃৎ, কতকগুলি লোক তাঁহার শত্রু, এরূপ প্রভেদ যে ধর্ম্ম তিনি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে কি সমুচিত ? যে কালে মানবজাতিতে ঈশ্বরসম্পর্কীয় উন্নত ভাব ছিল না সে কালে এরূপ প্রভেদ শোভা পাইত, যিনি সমুদায় মানবজাতিকে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্বে এবং সৌভ্রাত্রে এক করা আপনার জীবনের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাতে এ প্রকার বৈষম্য কিছুতেই শোভা পায় না। তিনি একবার নয় দুই

.ার নব্য ব্রাহ্মসমাজের ভিন্নমতের লোকদিগকে অনেকবার আক্রমণ করিয়াছেন, এমন কি 'ঈশ্বরের শত্রু' এ কথা বঙ্গভাষায় তাঁহা হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। তিনি আপনি বলিয়াছেন, যে সমাজে স্বাধীনতার ঈদৃশ সমাদর সে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দল হওয়া অপরিহার্য্য, অথচ তিনিই মতভেদাদি জন্য তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন ইহা কিরূপ কথা? মতভেদের জন্য কেশবচন্দ্র কখনও কাহাকেও তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন কি না, ইহা গভীর প্রশ্ন। জ্ঞানগত বৈষম্য জন্য আক্রমণ এবং সত্য ও ধর্ম্ম হইতে স্খলন জন্য আক্রমণ, এ দুই কিছুতেই এক নহে। সমাজের দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ অন্তরের গভীর প্রেম হইতে সমুত্থিত হয়, ইহা ঈশা প্রভৃতি মানবজাতির হিতাকাঙ্ক্ষিগণের দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই। যাহারা লোকের পাপদুঃখে উদাসীন তাহারা তাহার কোন সংবাদই লয় না, কিন্তু যাঁহারা তজ্জন্য আকুল তাঁহারা কি কখন উদাসীন থাকিতে পারেন? পাপের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে দেখা ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এই সকল ব্যক্তি কোন মানুষকে কোন কালে আক্রমণ করেন নাই, তাহার পাপকে আক্রমণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে একটি মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, পাপীকে আক্রমণ করিও না কিন্তু তাহার পাপকে আক্রমণ কর। কিন্তু লোকে বলে এরূপ মত কার্য্যতঃ জীবনে প্রতিপালিত হওয়া কি কোন সম্ভব? কেশবচন্দ্র যদি এমত প্রচার করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি জীবনে এ মত প্রতিপালন করিয়াছিলেন আশা করা যাইতে পারে, কেন না তাঁহাতে জীবন ও মত দুই স্বতন্ত্র ছিল না; যাহা তিনি জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই জগতে প্রচার করিয়াছেন। 'ঈশ্বরের শত্রু' এ শব্দ তিনি

কোন্ অর্থে ব্যবহার করিতেন, যাঁহারা তাঁহারা উপদেশাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ভজন জানেন। 'পাপ ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা' ইটি তাঁহার বিশেষ মত। আমরা প্রতিজন যখন পাপাচরণ করি, তখন ঈশ্বরের শত্রু হই। ফলতঃ আমাদিগের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা ও মিত্রতা উভয়ই আছে। যাঁহারা মনে করেন, কেশবচন্দ্র আপনাকে বাদ দিয়া অন্য লোককে ঈশ্বরের শত্রু নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে ভ্রম ঘটিয়াছে। তিনি তীব্র-পাপবোধে আপনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাপসম্ভাবনা দেখিয়া আপনাকে যেমন সেই সেই অংশে ঈশ্বররের শত্রু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কাহাকেও করেন নাই। জুডাসের তুল্য ঘৃণিত এ পৃথিবীতে আর কে আছে? কেশবচন্দ্র কি বলেন নাই, "আমি ঈশা নই, কিন্তু আমি সেই ঘৃণিত জুডাস যে রোষপরবশ শত্রু-হস্তে ঈশাকে সমর্পণ করিয়াছিল?" তিনি আপনার সম্বন্ধে এরূপ বলিলেন কেন? বলিলেন পাপ লক্ষ্য করিয়া। "আমি তত দূর জুডাসের মত যত দূর আমি পাপ ভালবাসি।" কেশব চন্দ্র আপনাকে এবং পরকে যে সমান দেখিতেন, পাপের প্রতি তীব্র আক্রমণব্যাপারেও তাহা কোন দিন বিঘটিত হয় নাই। তিনি আপনাতে পাপ দর্শন করিয়া তীব্রভাবে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতেন, তাই অপরের পাপের প্রতি সেই ভাবে দৃষ্টি করিয়াছেন। যদি কেহ বল্লেন, তিনি আপনার পাপের দিক্ না দেখিয়া যখন অন্য দিক্ দেখিতেন তখন যেমন আপনাকে সুকোমল দৃষ্টিতে দেখিতেন, সে প্রকার দৃষ্টিতে কি যাঁহাদের পাপ আক্রমণ করিতেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে পারিতেন? ঘোর পাপাচরণ করিয়া তীব্র আক্রমণের বিষয় হইয়া

তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন এমন কেহ যদি আজ বর্ত্তমান থাকেন, তিনি অবশ্য সাক্ষ্য দিবেন যে, কেশবচন্দ্র তৎপ্রতি সুকোমল ব্যবহার করিতে কখন কুণ্ঠিত হন নাই, পূর্ব্বে যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, পরেও সেই প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা যে ভাবগোপন নহে, তাহা তাঁহার উদার ব্যবহারেই নিয়ত প্রকাশ পাইত। 'পাপ ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা" ইহাতো সাধারণ কথা, বিশেষ ভাবে কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের শত্রু কাহাকে বলিতেন দেখা যাউক। "যেখানে বিধাতা ঈশ্বর স্বহস্তে ধর্ম্ম স্থাপন করিতেছেন সেই স্থান যথার্থ বিধানভূমি। এই বিধান-ভুক্ত লোকেরা ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা পরিচালিত। ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁহাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট করে। স্বয়ং ভগবান্ যাহা করেন তাহাই তাঁহাদিগের ক্রিয়া। এই বিধানভূমির বহির্ভাগে যে সকল মনুষ্য আছে তাহারা ঈশ্বর এবং বিধানের শত্রু। এই বিধা-নের ভিতরে আমাদিগের শ্রদ্ধেয় এবং ভক্তিভাজন পরলোক-বাসী মহাত্মাগণ রহিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম, য়িহুদি ধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্ম এই বিধানের অন্তর্গত। সুতরাং যাহারা বাহিরে দাঁড়াইল তাহারা ঈশ্বরের শত্রু এবং কেবল শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপাসক।" এ স্থলে সকলেই দেখিতে পাইবেন, যে কথায় কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের শত্রু নির্দ্দেশ করিয়াছেন সে কথা যাঁহারা ঈশ্বর ও ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহারা যে সম্প্রদায়ের হউন না কেন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেছে না। 'যাহাতে নর নারী উপাসনা না করে, ব্রহ্ম স্তব না করে, ব্রহ্ম দর্শন এবং ব্রহ্মবাণী শ্রবণ না করে, অধিক ক্ষণ ব্রহ্মধ্যান না করে' এরূপ যাহাদিগের চেষ্টা, এমন কি ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরের কথা

শ্রবণ যাহারা অসম্ভব মনে করে, ভণ্ডাম মনে করে, বুদ্ধিকে নেতা করিয়া আত্মকর্তৃত্বে কার্য্য করে, তাহারাই ব্রহ্মের শত্রুরূপে নির্দ্দেশ্য। এরূপ ভাবাপন্ন লোকেরা যদি কোন ধর্ম্মের নামে পরিচয় দিয়া ছদ্মবেশে বিচরণ করে তবে তাহারা ঈশ্বরের বিশেষ শত্রুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে, ইহাই বা বিচিত্র কি? এই সকল ব্যক্তির প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কেশবচন্দ্রের অনুমোদিত ছিল, মোহম্মদ সমাগমের গুটিকয়েক কথা শুনিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। "ইহারা নিষ্ঠুর ডাকাত, তোমার (ঈশ্বরের) শত্রু জানিয়া আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব, ইহাদের শরীর স্পর্শ করিব না, আক্কেল কাটিব।" "আয় ভাই মোহম্মদ আয়; শান্তি খাঁড়া নিয়ে আয়।...আমরা তাহাদের শরীর ছোঁব না, তাহাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদের মন্দ ভাব কাটিব।" ঈশ্বর-বিরোধিগণের মঙ্গলের জন্য তাহাদের মন্দভাব তাহাদের মন্দ বুদ্ধি কাটিবার জন্য কেশবচন্দ্র যদি সুতীক্ষ্ণ বাক্যাস্ত্র চালনা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহার উদার প্রেমের ধর্ম্ম কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল, ইহা কে বলিবে?

এখন দেখা যাউক তাঁহার জীবনের তৃতীয় মূলতত্ত্ব একাত্মতা মধ্যে স্ববিরোধিতা দোষ আছে কি না? এই একাত্মতাই কেশব-চন্দ্রের জীবনের বিশেষত্ব। এখানে যদি স্ববিরোধিতা দোষ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে তাঁহার সমগ্র জীবন নিষ্ফল হইয়াছে। তিনি সর্ব্বসামঞ্জস্যের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, এই সর্ব্বসামঞ্জস্য একা-ত্মতামূলক। পৃথিবীতে যত বিধান আসিয়াছে, সকলের সঙ্গে একী-ভূত হইয়া যাওয়া এই একাত্মতার প্রধান কার্য্য; যোগী, ঋষি, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, মুষা প্রভৃতি সহকারে তাঁহাদের ধর্ম্মে ও সত্যে এক

হইয়া যাওয়া, ইহাই তাঁহার প্রচারিত একাত্মতা। হিন্দু ও য়িহুদী ধর্ম্মসম্বন্ধে দুই প্রধান জাতির প্রতিনিধি কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে পারেন, "বিরোধীদের প্রাণের মধ্যেও নববিধান প্রবিষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টান হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত হইতেছে। কৃষ্ণে খ্রীষ্টে মিলন হইতেছে।" কিন্তু কার্য্যকালে দেখিতে পাওয়া যায় কৃষ্ণকে প্রেমধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া তাঁহাকে সরাইয়া রাখিয়াছেন, খ্রীষ্টকে লইয়া যত বাড়াবাড়ী করিয়াছেন। তিনি জাতিতে হিন্দু হইয়া একজন বিজাতীয় লোককে আনিয়া ধর্ম্মরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদ অর্পণ করিলেন ইহা এ জাতি সহিবে কি প্রকারে? দেশের লোকের মুখে এই নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায় যে, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টকে এত দূর বাড়াইয়াছেন যে, সময়ে যদি সমুদায় ভারতবর্ষ খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হয়, তাহাতে তাঁহার বিশেষ আহ্লাদই হইবে। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় তিনি প্রচার করিলেন, কিন্তু এক ঈশাতে সমুদায় ধর্ম্মের সমন্বয় দেখাইয়া আর সকল ধর্ম্মকে কার্য্যতঃ অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিলেন। কেশবচন্দ্র কি বলেন নাই, "যে স্বর্গরাজ্য কোন সম্প্রদায় জানে না, কোন সম্প্রদায়িক মত শিক্ষা দেয় না, যাহার মূলতত্ত্ব ঈশ্বরকে ভালবাসা মানবকে ভালবাসা, যাহা সমুদায় মানবজাতিকে এক জন মানুষে, এমন কি ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রীষ্টে এক করে, সেই স্বর্গরাজ্যে তাঁহারা (হিন্দু, বুদ্ধ, মুসলমান) মিলিত হয়েন।" যিনি সকল ধর্ম্ম, সকল ঋষি, সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সর্ব্ববিধ যোগ এক করিবেন, তাঁহার মুখে ঈদৃশ কথা কি স্ববিরোধিতা প্রকাশ করে না? দেশীয় ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া তিনি কেন কৃষ্ণেতে সকলকে একীভূত করিলেন না? কৃষ্ণের ভিতরে যোগসমূহের একতাসম্পাদনের যে

ভাব ছিল, তাহা লইয়া তাঁহাতে সকলকে একীভূত করা কি যুক্তিযুক্ত নয়? এ বিষম পক্ষপাত কেন? ইহা কি ইংরাজী শিক্ষার ফল নয়? লোগস্ ও খ্রীষ্টকে এক করিয়া লোগসে সকলকে এক করা অপেক্ষা পুরুষাবতার ও কৃষ্ণে সকলকে এক করিলে কি ক্ষতি ছিল? হিন্দুগণ অবশ্য বলিবেন, কেশবচন্দ্রের খ্রীষ্টের প্রতি বিষম পক্ষপাতই ঈদৃশ অযুক্ত আচরণের হেতু। কেশবচন্দ্র আনন্দের ভূমিতে একাত্মতা স্থাপন করিলেন; ঈশাতে আনন্দ কোথায়? আনন্দতো কৃষ্ণেতেই। এ দেশের সমুদায় ধর্ম্ম যে আনন্দে পর্য্যবসন্ন। এ দেশের ধর্ম্মের সঙ্গে অন্য দেশের মিলন করাই স্বাভাবিক; অন্য দেশের ধর্ম্মের সঙ্গে এ দেশের ধর্ম্মের মিলন করাইয়া লই-বার কোন কারণ নাই। অবশ্য কারণ আছে, অন্যথা কেশবচন্দ্র ঈশাতে সকলের একতা সাধন করিতে যত্ন করিতেন না। ঈশ্বর পিতা, মানব পুত্র, পিতা পুত্রের একত্ব পরমধর্ম্ম। মানুষকে মানুষ না রাখিলে, ঈশ্বরে ও মানুষে যোগ কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। চিত্তবৃত্তির নিরোধ মূলযোগ নয়, যোগ দুই বস্তুর একত্বসম্পাদন। এক মানবে সমুদায় মানবজাতিকে এক করিয়া ঈশ্বর সহ সেই মানবের যোগসম্পাদন নবীন যোগের প্রণালী। হিন্দুগণের মধ্যে মানব বিলুপ্ত, কোথাও মানব বা ঈশ্বরতনয়ের স্থিতি নাই। কৃষ্ণ ঈশ্বরতনয় নহেন স্বয়ং ঈশ্বর। এ দেশের যত অবতার, সকলেই ঈশ্বরের অবতার, ঈশ্বরতনয়ের অবতার নহেন। শ্রীচৈতন্য আপনাকে ভক্তাবতার ব[illegible]য়া ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু উহা এ দেশের ভাববি[illegible]রাধী জন্য তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বরা-বতার করিয়া স্থাপন করিলেন, এখন এত দূর হইয়াছে যে, অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব চৈতন্যের নিকটে নিবেদিত অন্নদ্বারা

কৃষ্ণের ভোগ দিয়া থাকেন। হার্বার্ট স্পেন্সার বাহ্বাস্ফোট করিয়া বলিয়াছেন, এখন বিজ্ঞান সর্ব্বগতত্ব (Immanency) প্রচার করিতেছেন। কিন্তু এ দেশে এ ভাব একেবারে মজ্জাগত। ইঁহারা যে পদার্থ ধরেন তাহাতেই ব্রহ্মদর্শন করেন, এত দূর যে ব্রহ্মদর্শনে সে পদার্থ বিলীন হইয়া যায়। য়িহুদিগণের ঈশ্বর সর্ব্বাতীত (Transcendental); এই সর্ব্বাতীতত্বের প্রাধান্য জন্য ঈশা যোগী হইয়াও অপরকে উপদেশ দেওয়ার সময়ে 'স্বর্গস্থ পিতা' বলিতেন। হিন্দু যে ব্যক্তিতে ব্রহ্মাবির্ভাব অনুভব করেন সে ব্যক্তিই ব্রহ্ম হইয়া যান, সেখানে আর এই জীব এই ব্রহ্ম এরূপ ভেদ থাকে না। ঈশা যোগের একত্ব নিয়ত অনুভব করিতেন সত্য, কিন্তু পিতা ও পুত্র এ ভাব তাঁহাতে বিলুপ্ত হইত না। "আমি এবং আমার পিতা এক" এ কথা বলিয়া তিনি যোগের একত্ব ব্যক্ত করিলেন বটে, কিন্তু 'আমিও আমার পিতা" এ ভেদ কিন্তু তখনও তাঁহাতে অন্তর্হিত হয় নাই। "আমি এবং আমার পিতা এক" এ কথা শুনিয়া য়িহুদিগণ এই বলিয়া তাঁহাকে অপরাধী করিল যে, তিনি আপনাকে ঈশ্বর করিলেন। তিনি তাহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন, আমি বলিলাম আমি ঈশ্বরের পুত্র। আপনার জীবত্ব রক্ষা করিয়া যোগের একত্ব ঈশাই আপনার জীবনে দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণ প্রভৃতি যত অবতার এ দেশে হইয়া গিয়াছেন সকলেই ঈশ্বরাবতার; কেহ পুত্রাবতার নহেন।

---

*In Hinduism God Himself appears on earth as man. The Avatar is the identical Creator of the universe, the Infinite Supreme Brahma Himself. In Christianity it is the Son of God we see in history, not the Creator, the Unborn,

পুত্রাবতার না হইলে সকল মানবকে এক মানবে এক করা যাইতে পারে না। ঈশা ভিন্ন বিধানের ইতিহাসে আর কেহ যখন আপনাতে মানবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমুদায় মানবের সহিত একত্ব এবং ঈশ্বরের সহিত একত্ব ঘোষণা করেন নাই, তখন তাদৃশ একত্ব সাধনের উপায় তিনি ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না। কেশবচন্দ্র বিধানের ইতিহাসে বিধাতার লীলা যথাযথ পাঠ করিতেন। বিধাতা যাঁহাকে দিয়া যাহা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, সে বিষয়ের জন্য কেশবচন্দ্র তাঁহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা না করিলে তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অতিক্রম করিতেন, সুতরাং কেশবচন্দ্র এক ঈশাতে বা ঈশ্বরপুত্রে সমুদায় মানবতনয়গণের একত্ব সাধন করিয়া স্ববিরোধিতার দোষে নিপতিত হন নাই বরং ইহাতে সু-অবিরোধিতাই প্রকাশ পাইয়াছে। কেশবচন্দ্র কোন মানবকে স্বয়ং অবতীর্ণ ঈশ্বর বলিতেন না, সকলকেই ঈশ্বরতনয় বলিতেন, সুতরাং তিনি তনয়ত্বে তাঁহাদের একত্ব সাধন করিবেন, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক।

স্বাধীনতা, সমতা ও একাত্মতা, এই তিন মূলতত্ত্ব কেশবচন্দ্রের

Eternal, but the First Begotten Son. The Hindu identifies the Lord of Heaven and the Avatar on earth in an essential and indivisible unity, recognising no distinction and repudiating the very possibility of a difference. The Christian, while recognising the identity, distinguishes the one from the other — the Father from the Son. . . . . Krishna is nothing if not the Almighty God. Christ is nothing if not the Son of God.—*The New Dispensation, July 22 1881.*

জীবনে স্ববিরোধিতাদোষদুষ্ট নহে, সুন্দর অবিরোধিভাবে অবস্থিত, মনে হয় এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহাতে একপ্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের জীবনে এই সকল মূলতত্ত্ব উহাদের বিপরীত মূলতত্ত্ব সহ অবিরোধিভাবে মিলিত হইয়াছে ইহা প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের কি লাভ? আমাদের জীবনে যদি স্বাধীনতা ও অধীনতার মিলন না হয়, বৈষম্যে সাম্য প্রকাশ না পায়, একক্ষেতে সকলের একাত্মতা সাধিত না হয়, তাহা হইলে এত ক্ষণ নিষ্ফল আলোচনায় বৃথা সময়ক্ষেপ হইল। আমরা বিবেকী হইয়া স্বাধীন হইব, প্রেমিক হইয়া অধীন হইব, রিপুগণের নিকটে আমরা কোন দিন আমাদের মস্তক প্রণত করিব না, কিন্তু ঈশ্বরতনয়গণের নিকটে আমাদের মস্তক চির অবনত রাখিব, আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব, কিন্তু যে বিষয়ে আমরা প্রত্যাদেশ পাইলাম না, অপরে সে বিষয়ে প্রত্যাদেশ পাইলেন বলিয়া অসূয়াপরবশ হইব না, বরং তাঁহাদের প্রত্যাদেশের ফলভোগের জন্য তাঁহাদের নিকটে প্রণত হইয়া উহা গ্রহণ করিব, অধিকন্তু সর্ব্বদা তজ্জন্য শ্রদ্ধা সম্ভ্রম হৃদয়ে পোষণ করিব, কোন ভাই বা ভগিনীকে হৃদয়ের বাহিরে রাখিব না, প্রাণমন্দিরে প্রাণেশ্বরের চরণতলে তাঁহাদের সকলকে একপুত্র এককন্যারূপে মিলিত সর্ব্বদা দেখিব ও সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইব। কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলতত্ত্বগুলি যদি আমাদের জীবনে প্রকাশ না পায়, এবং উহারা সুন্দর অবিরোধী ভাব প্রকাশ না করে, তাহা হইলে তাঁহার জীবন আমাদের সম্বন্ধে বিফল হইল। তাঁহার জীবনের তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া যদি আমরা কেবল বিস্ময়-

রসে মগ্ন হই, কি অদ্ভুত জীবন ভগবান্ এ যুগে কেশবচন্দ্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দি, তাহা হইলেই কি আমাদের নিকটে ঈশ্বর যাহা চান তাহা নিষ্পন্ন হই গুত অতএব আসুন আমরা সকলে কেশবচন্দ্র যে ভাবের ভাবুক ছিলেন সেই ভাবে ভাবুক হই, যে ঈশ্বরকে তিনি প্রাণের সর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরকে আমাদের প্রাণের সর্ব্বস্ব করি। কেশবচন্দ্র কিছু নিজ গুণে অদ্ভুত জীবন লাভ করেন নাই, ঈশ্বরের তৎসম্বন্ধে যে বিশেষ অভিপ্রায় ছিল সেই অভিপ্রায় অনুসরণপূর্ব্বক তিনি ঈশ্বর হইতে তাদৃশ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের সম্বন্ধে আমাদের ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তাহা বুঝিয়া যদি আমরা তাহার অনুসরণ করি, নিশ্চয় আমরা কেশবজীবনানুরূপ জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। যদি আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের জীবনে এ ব্যাপার সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে বিধান পৃথিবীতে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? কৃপাময় ঈশ্বর কৃপা করুন, আমাদের প্রতিজনের জীবনের স্ববিরোধিতা দোষ, সু-অবিরোধিতায় পরিণত হউক।